ঢিলখা

মিহির বন্দ্যোপাধ্যায়

সবাই মিলে জড়াজড়ি করে শুয়েছিল। ঠিক শোয়া বলতে যা বোঝায় তা নয়; পা মুড়িয়ে ঝিমানো। সূর্য আড়মোড়া ভেঙে উঠতেই ওরা ডাক পাড়ে- গা-হাত-পা ঝাড়া দেয়। আগের দিন খাওয়া হয়েছে বিকেলে। অন্যসময় আলাদা। কিন্তু শীতের আলো ঝুপ করে নেমে যায়। গতকাল দল বেঁধে বেড়িয়েছিল গো পাড়ায়। জায়গাটার খোঁজ ঢিলখা নিজেই দিয়েছিল। কু চো খড় আর গোবর ডাঁই করা, খাবারে ছড়াছড়ি। অন্যদিনের থেকে পেট ভরেছিল ভালোই। তবু শীতের দীর্ঘ রাত কাটতে না কাটতেই পাকস্থলীতে হাহাকার। গলাটা শুকিয়ে আছে। জল খাবে সে গুড়ে বালি। কালু -সূয্যিমুখির ঝড়ড়ায় জলের পাত্র গ্যাছে উল্টে। যার গায়ের রং অমন হলুদ তাকে সূয্যিমুখী ছাড়া কী-ই নামে আর ডাকা যায়। সূয্যিমুখির রূপের দেমাক। কালু গা ঘেঁষে বসতেই ক্যাঁক করে উঠল - 'গায়ে গন্ধ! সরে বস।' ব্যাস আর যায় কোথায়! কথায় কথায় দু'জনে ঝাপটা-ঝাপটি আর গ্যালো জলের পাত্র উল্টে।

এমন তাজ্জব নাম এ'তল্লাটে আর কারো নেই । জন্মের পর তার যে একটা ভালো নাম ছিল তা সে গেছে ভুলে। শিশু ঢিলখা তখন মায়ের হেপাজতে। মা শেখাতো কিভাবে খাবার তুলতে হবে,'বার দু' তিনেক আঁচড় কেটে পেছনে সরে যাবি, আর কিছু নড়াচড়া করলেই তুলে নিবি।' ঘুরতে ঘুরতে ক্লান্ত হয়ে মা ভাইবোনদের জড়িয়ে উবু হয়ে বসে। তার ওম-স্নেহ মেখে নিত তার সবাই। মায়ের সাথে সেদিন এ-বাড়ির উঠোন ও-বাড়ির খিড়কি - বাসন মাজার ঘাট - ছাইকুঁড় ঘেঁটে ভ ালো-মন্দ খেতে বেড়িয়েছিল। হঠাৎ মা ডেকে উঠল, 'পালা ওরা ঢিল ছুঁড়ছে। সবাই পড়িমরি করে ছুটল। ঢিলখা সবার সঙ্গে প্রথমে ছুটলেও পরে মনে করল দেখি তো কী ব্যাপার, ব্যাস! ঘটে গেল তখনই ঘটনাটি। প্রথম খানিকটা ওপরে উঠে ধপ করে নিচে। ঘাড়টা যেন ভোঁ করে ঘুরে বোবা মেরে গ্যাল। হাতে পায়ে খিঁচ। ঢিলটা লেগেছিল ঘাড়ে। সপ্তাহখানিক মনেপ্রাণে টানাটানি। চাষীর বউ ঘাড়ে চুন-হলুদ লাগিয়ে দিল। ও-বাড়ির ছেলে ঢিল ছুঁড়েছিল, তাই এ-বাড়ি ও-বাড়ির গলা ফাটাফাটি। তারপর একদিন ঠিক হল সবাই। ব্যাথা কমল। ধীরে ধীরে সে-ও গায়ে গতরে বাড়ল। কিন্তু ঘাড়টা সেই থেকে ডান দিকে ফোলা, বাঁদিকে কাত। আর তার নামটা গেল পাল্টে। সবাই ডাকতে শু করল - ঢিলখা।

পেট যত চোঁ... চোঁ... করছে ওরা রাত পোহাতে না পোহাতেই ডাকছে তত জোরে, 'দোর খোল চাষী-বউ দোর খোল।' দরজা খুলতে দু'চারজন বের হল। দরজা খুলেছে চাষী নিজেই। ব্যাপারটা টের পেল ঢিলখা বাইরে আসতে গিয়ে। চাষীর কর্কশ হাতে তাকে খপ্ করে তুলে নিল। এ-ওর মুখ চাওয়া- চায়ি করতে করতে বেড়িয়ে গেল সবাই। চাষী ঢিলখার মাথ ায় আদরের চড় কষিয়ে বলল,'তুই ঘরে যা, দুপুরে মাঠ দেকতে যাবি।'

বন্ধ হল দরজা। গোয়াল থেকে গো ডাকল হাম্বা - আ - আ...। বোধহয় হাঁসের খোঁয়ার খুলেছে প্যাঁক-প্যাঁক প্যাঁক-প্যাঁ াক করতে ওরা চলেছে বিলের দিকে, সকালে বিলের পাড়ে গেরি-গুগলি। এ-সময় চাষী-বউ গোবর ছরা দেয়। উঠোনের মাঝে গোল করে লেপে। একসময় ধানের গোলা ছিল। তবে সে গোলা ঢিলখা তো নয়ই তার মাও শুনেছিল তার দিদিম ার মুখ থেকে। নতুন ধানের আহামরি গন্ধের সথে নাকি আমিষ পোকামাকড়ের তুলনাই চলে না।

বন্ধ ঘরে একা মুখ বুজে খিদে-তেষ্টায় ঢুলছে ঢিলখা। গত বর্ষায় ওপাশের মাটির দেওয়াল থেকে কঞ্চি বেরিয়ে পড়েছে। র াতে হায়না- শেয়ালের উৎপাতের জন্য সেখানে চাষী গুঁজেছে সুপুরির কোল। নিরাপত্তার দিকে থেকে থাকার জায়গা তে াফা। সে ব্যাপারে সন্দেহ নেই। তবে ঝটপট করেও আজ আর বাইরে বের হবার ফাঁক-ফোঁকর পেল না। অবশেষে গলা

ফুলিয়ে ডাকতে শু করল ঢিলখা। ডাকের পর ডাক।
চাষী বউ জানতে চাইল, কী ব্যাপার, ওটাকে আটকে রেখেছে কেন?
চাষী বলল, আমার সাথে মাঠ দেখতে যাবে।
— সে তো দুপুরে। এখন ছাড়ো।
— উঁহু ছাড়লে হবে না।
— কেন?
— দানাপানি বেশি খেলে তেজ মিইয়ে যাবে। ওকে বরং একমুঠো সর্ষে দাও।
দরজা ফাঁক করে চাষী-বউ সর্ষে দিতেই ঝাঁপিয়ে পড়ল ঢিলখা। খুটে খুটে খেতে শু করে। নাক জ্বলে চোখে জল আসে।
চাষী মাঠ দেখাতে যাবে। কোথায়? এর আগে লালি গিয়েছিল চাষীর সাথে মাঠ দেখতে। পাঁচ-ছ'জনের এই দলে ওরা দু'জন মরদ। ঢিলখার সুঠাম শরীর হলে কী হবে ঘাড়টা কাত। যেন ভাবুক বুড়ো। লালি তার উল্টো। তার মেজাজের কাছে আর সবাই সামনে নত হয়। পেছনে আবার তারাই লালিকে গোঁয়ার গোবিন্দ বলে। চাষীর সাথে সে-ও এক দুপুরে মাঠ দেখতে সেই যে বের হল আর ফেরেনি। লালির জন্য সন্ধের পর ওরা কান খাড়া করে থাকায় শুনেছিল —
— যাও — যাও! জিলিপি খাইয়ে বুঝ দিতে হবে না। আহা! কি চেহারা হয়েছিল। পরবে ছাড়লে হাতে কিছু আসতো।
— রাখো তোমার চেহারা। ব্যাটা লড়ার কায়দাই রপ্ত করেছিল। এক ঝাড়েই কাত হয়ে পড়ল।
চাষীর গলা শুনলেও ওরা বোঝেনি কিছুই। লালি না ফেরার নিঃসঙ্গ ঢিলখা। দলের সাথে প্রতিদিন সকাল বের হয়। ঝপঝপ কিছুটা খেয়ে ছাইগাদার মাঝখানে গোল খোদল করে তারপর শীতের রোদে পিঠ দিয়ে বসে। ডেঁয়ো পিঁপড়ে — আরশোলা — গুবরে পোকা অনায়াসে তার সামনে দিয়ে চলে যায়। একটা মড়া ফড়িং টেনে নিয়ে গেল একদল লাল পিঁপড়ে। ফড়িংটাকে অনায়াসে সে তুলে নিতে পারতো। অন্য কেউ তার জায়গায় হলে অবশ্য তাই করতো। কিন্তু লালি না ফেরায় মনটা তার ভালো নেই।
গতকাল এরকমই বসেছিল। চোখ পড়ল লম্বা কেঁচোর দিকে। মাতববরি চালে কোনোকিছু ভ্রূক্ষেপ না করে ঢিলখার সামনে দিয়ে চলেছে। ঢিলখা ওকে চমকে দেওয়ার জন্য গা ঝাড়া দিল। সামান্য চমকেও উঠল না। ঢিলখা মনে মনে বলল, ভারি রাজকীয় চাল দেখাচ্ছে বাছাধন। উঁহু, একে ছেড়ে দেওয়া ঠিক হবে না। সে যেই উঠে কেঁচোটা তুলে নেবে ভাবছে ঠিক সে-সময় চোখ পড়ল হুলোর ছিঁচকেমিতে। সে গুটি গুটি হামাগুড়ি দিচ্ছে টি টি-র দিকে। দিন কুড়ি বয়সের এই ছানাটা পরিবারে সকলের কাছে আদরের। আর তাকে দেখে হুলোর নোলা সপ্‌সপ্‌ করছে, দাঁড়াও দ্যাখাচ্ছি! হই হই করতে করতে তেড়ে গেল ঢিলখা। হুলো থতমত খেয়ে ল্যাজ গুটিয়ে দে ছুট! চাষী দেখেছিল। সে বলল, বেশ লড়াকু হয়েছিস তো!
চাষীর বাহবা পেয়ে গর্বে গুর-গুর করে উঠল ঢিলখা। আজ দুপুরে দরজা খুলে চাষী যখন হাত বাড়াল ঢিলখা ধরা দিল সহজেই। আদর করে চাষী ঘাড়ে গাল ঘষে দিল। সারাদিন অনাহারে আটকে থাকার রাগ মুহূর্তে জল। চাষী বলল, চল মাঠ দেখতে।
কে বগলদাবা করে আল ধরে হনহন করে চলেছে চাষী। চাষীরা মাথা থেকে তেলজল চুঁইয়ে পড়ছে। সারা সকাল জলটুকুও পায়নি ঢিলখা। চাষী তার মাথায় হাত বোলাচ্ছে, কী রে পারবি তো?
কি পারবে সে জানে না। সকালে খাওয়া সর্ষেদানার ঝাঁঝে এখনও পেট জ্বলছে। তবে চাষীরা সোহাগ সে কনুই আর বগলের মাঝে লেপটে আছে। চোখ ঘুরিয়ে এদিক সেদিক দেখছে। মাঠে ধান নেই। আল ছেড়ে চাষী আড়াআড়ি মাঠের ওপর দিয়েই চলেছে। এত দূরে সে আগে আসেনি। ঢিলখা-ই নয়, তাদের পরিবারের কেউ আসেনি। যেদিন লালি মাঠ দেখতে গিয়ে আর ফিরল না, সেদিন ওরা অনেকদূর খুঁজতে এসেছিল লালিকে। তবে সেও এতদূর নয়। চাষী তাকে কোন মাঠ দেখাতে নিয়ে যাবে আর কত দূর? একভাবে চাষীর কর্কশ-হাত আর বগলের চাপে কন্‌কন্‌ করছে বুক-পিঠ। বোধহয় এইভাবে বগলদাবা থাকতে লালি অতিষ্ট হয়ে উঠেছিল। আর চাষী তাকে হয়তো ছেড়ে দিয়ে গ্যাছে অচিন মাঠে। ঢিলখা ছটফট করতে গিয়েও চুপ করে থাকে। ভাবে একবার ডেকে বলি, একটু নিজের পায়ে দাঁড়াতে দাও। তোমার বগল চাপে হাড় গোড় গুঁড়ো হয়ে যাবে।

কিন্তু না-চেনা পথের কথা ভাবতেই তার গলা কাঠ হয়ে যায়।
চাষী আমবাগান পেরিয়ে বাঁয়ে শুকনো ডোবা ফেলে বাঁধের পথ ধরে। চাষী বলে ওই দেখ মাঠ দেখা যাচ্ছে। ঢিলখা ঘাড় তুলে দেখার চেষ্টা করে। চাষী যেন ছুটে চলেছে।
মাঠের চারপাশে গোল হওয়া মানুষের জটলা। তার মত কেউ কেউ তাদের বগলে বা হাতে ধরা। পায়ে দড়ি বাঁধা। জটলা ঠেলে চাষী এগোয় সামনে। মানুষের উল্লাস।
চাষী বলে, দ্যখ কেমন লড়ছে।
— বাহ! দে - দে কাটারি!
— দ্যাখো তেরি! ঝুঁটি যেন নবাবের সেপাই!
— রাখ তোর ঝুঁটি। এ-হল ইংরেজি হিরো গো বুস্‌লি। দে-দে কেরাতে
— হিরো কোথায় ও যে মোচ কামানো
— আরে বাববা! এ-হল ধরমেন্দর! অই-অই দিল গো।
দেখে। তার দুই স্বজাতি লড়ছে। একজনের মাথায় লাল ঝুঁটি। অন্যজনের ঝুঁটি নেই। রাগে ফুঁসছে দু'জনেই। চারপাশে মানুষের উল্লাস। মল্লভূমিতে আমৃত্যু লড়ছে দু'জন। ঢিলখা ফ্যাল ফ্যাল করে দেখে। ভাবে কিসের জন্য এ-লড়াই? পৃথিবীর আস্তাকুঁড়েতেও তাদের খাবার প্রাচুর্য্য। ঢিলখা দু'জনের লড়াকু - রোঁয়া ফুলে ওঠা চেহারার দিকে তাকিয়ে খুঁজতে থাকে লড়ার কারণ।
দিলো ঝুঁটি উড়িয়ে। সময়মতো মাথা না সরালেই ঝুঁটির সাথে মাথাও যেত উড়ে। উড়িববাস তোদের নখে কত ধার রে! ঢিলখা বিস্ময়ে ঝুঁটি কামানো ধরমেন্দর পায়ের দিকে তাকায়। ওটা কি?
— বা! বা! ধরমেন্দর মার মার টান গলার .....
ওদের পায়ে বাঁধা নখের মতো ওটা কি! ওরে থামা, থামা তোদের অধর্মের লড়াই। তোদের পায়ে বাঁধা ইস্পাতের নখ। এসব তৈরি। অস্ত্র আমাদের নয়, লড়তেই যদি হয় লড় নিজেদের দাঁতে-নখ।
ওদের সাবধান করার জন্য ঢিলখা ডেকে ওঠে, কঁক কঁকর কঁক ..... কঁক কঁকর কঁক!
চাষী বলে, সাবাশ ঘাড় তেরা এই না হলে মোরগ।
চাষীর থাবা থেকে মুক্তি চায়।
চাষী বলে, সেবারে লালিটাকে হারিয়েছি। বুঝে লড়িস। ওফ্ অমন ঠ্যাং যে খেয়েছে তার বাহ্যে হোক।
চাষী এবার দু'হাতে চেপে ধরে ঢিলখাকে। একজন বাঁধতে থাকে তার পায়ে ইস্পাতের নখ। আর বাঁধা হতে যেই তাকে ছাড়া সে ঘুরকার খায় মল্লভূমির চারপাশে।
লোকে বলে, গতবারে মন্টু হেরেছিস এবারে দেখছি পুষিয়ে নিবি।
খোঁজে এই মাঠ — এই বাইরে বাইর তার পরিচিত ছাইগাদা। শীতের রোদ্দুর পিঠে মেখে নেওয়া যায় এমন আস্তাকুঁড়ের নিরাপদ খোদল তৈরী করা জন্য সে পা ছোঁড়ে। ইস্পাতের নখ হাওয়ায় হিস্ হিস্ করে ওঠে। গোল হওয়া জটলার দিকে তাকিয়ে সে ডাকে কঁকর কঁক তফাৎ যাও। তোমাদের ধারালো নখ আমার পায়ে। পথ ছাড়ো — কঁক কঁকর কঁক ..... কঁকর কঁক।

সৃষ্টিসন্ধান
Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com